ধর্ম কি এবং কেন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কলকাতা

এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা আলোচিত এবং বিতর্কিত বস্তু সম্ভবত ধর্ম এবং কোন কোন মহলে সর্বাপেক্ষা নিন্দিতও। কেউ বলছেন, ধর্মই দেশের সর্বনাশের মূল, প্রগতির পথে সর্ববৃহৎ প্রতিবন্ধক কেউ বলছেন, ধর্মই দেশ ও জাতির অস্তিত্ব ও উত্থানের ভিত্তি, সমৃদ্ধির পথে দূরত্ব-প্রস্তর(milestone) কেউবা বলছেন, ধর্ম বস্তুটি নিয়ে শিক্ষিত মানুষদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই , এটা নিতান্তই অন্তঃপুরের ব্যাপার অথবা অশিক্ষিত এবং দেহাতী মানুষদের বিষয়।

বলা বাহুল্য, যে-ধর্ম আজ আমাদের দেশে এত আলোচনা, বিতর্ক, নিন্দা-উপেক্ষার কেন্দ্রবিন্দু তা কিন্তু মোটেই 'ধর্ম' নয়, তা হলো 'ধর্মমত'-সাম্প্রদায়িক ধর্মমত। ধর্মের সঙ্গে ধর্মমতকে মিশিয়ে ফেলা হয় কিন্তু ধর্ম এবং ধর্মমত কখনোই সমার্থক নয়। ধর্মমত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানুষের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। যেকোন ধর্মমত বা যেকোন সম্প্রদায়-সে যতই প্রাচীন হোক না কেন-ইতিহাসের এক-একটি যুগে, এক বা একাধিক ব্যক্তির (কোথাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম অথবা কাল জানা গিয়েছে , কোথাও বা তা অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে।) নেতৃত্বে প্রবর্তিত হয়, কোন কোনটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, আবার কোন কোনটি অল্পকাল বা দীর্ঘকাল পরে লুপ্ত অথবা শক্তিহীন হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'ধর্ম' বলতে যা বোঝায় তার উদ্ভবের কোন কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয় , কাদের মধ্যে এবং কোথায় তার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল তা নির্ণয় করাও অসম্ভব। সেইসঙ্গে এটাও আবার সত্য যে , প্রকৃত অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার উন্মেষলগ্ন নিরূপিত না হলেও তার অস্তিত্ব সন্দেহাতীত এবং তার যেমন প্রাকৃতিক বিলুপ্তি কখনো সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় তাকে নিস্তেজ করাও।

ভারতীয় ঐতিহ্যে 'ধর্ম' শব্দটি সুগভীর তাৎপর্যবাহী। বলা হয় , ধর্ম হলো সেই অনির্বচনীয় বস্তু যা না থাকলে সভ্যতা টিকবে না, সমাজ বাঁচবে না, মানুষ 'মানুষ' থাকবে না। মহাভারতে (কর্ণপর্বে) বলা হয়েছে-"ধারণাৎ ধর্মঃ"-ধর্মের ধর্ম হলো ধারণ করা। "ধর্মঃ ধারয়তে প্রজাঃ "-যা সভ্যতাকে ধারণ করে , যা সমাজকে ধারণ করে , যা মানুষকে ধারণ করে তাই ধর্ম। 'ধর্ম' সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে এটি নিষ্পন্ন। পাণিনি বলছেন, 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা'।

এখন প্রশ্ন হবে : বুঝলাম যে, যা সভ্যতাকে, সমাজকে এবং মানুষকে ধারণ করে, এককথায় তার নাম 'ধর্ম'। কিন্তু ধর্ম বস্তুটি আসলে কি? ধর্ম কি তা এককথায় বলা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সহস্র কথাতেও। পরমসত্য বা ব্রহ্মের মতোই ধর্ম অনির্বাচ্য বস্তু। সেই কারণে উপনিষদে ধর্ম এবং সত্য বা ব্রহ্মকে সমার্থক বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ধর্ম হলো জীবনের অমৃত, জীবনের মধু ধর্ম জীবনের রস , জীবনের সার। তবে অনির্বাচ্য ব্রহ্মকে যেমন আমরা একটি বাক্যে বর্ণনা করার চেষ্টা করি -"তিনি পরম প্রেমস্বরূপ " বলে, ধর্মকেও আমরা একটি বাক্যে এইভাবে সংজ্ঞিত করতে পারি-"প্রেমেরই অপর নাম ধর্ম " অথবা "ধর্মের অপর নাম প্রেম "। বস্তুত, সভ্যতা, সমাজ এবং মানুষ - সকল কিছুর জীবনীশক্তিই হলো প্রেম। প্রেমই পশুর সঙ্গে মানুষের , দুর্বৃত্তের সঙ্গে সাধুর , পাপীর সঙ্গে সন্তের

পার্থক্যের সূচক। ধর্ম আবহমানকাল ধরে মানুষের অন্তরে কখনো সুপ্তভাবে , কখনো ব্যক্তভাবে পরমপ্রেমকেই জাগ্রত রেখেছে।

ওপরের আলোচনায় আমরা বুঝলাম যে, ধর্ম হলো প্রেম। এখন প্রশ্ন হবে প্রেম কি? প্রেম হলো সেই বোধ বা সেই দৃষ্টি, যাতে 'আমি-তুমি-সে' ভেদ থাকে না, 'আত্ম-পর' বুদ্ধি তাকে না। সকলের মধ্যে আমি , আমার মধ্যে সকলে। অন্যের সুখে আমার সুখ , অন্যের দুঃখে আমার দুঃখ। এই বোধ , এই উপলব্ধি, এই দৃষ্টির নাম প্রেম। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। "-সকলকে যিনি আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা। উপনিষদ্, গীতা বেং ভারতীয় শাস্ত্রের ভাষায় এর নাম সমদর্শন বা একত্বদর্শন। আমি যে আমার নিকটজনকে ভালবাসি, তার দুঃখে দুঃখ অথবা সুখে সুখ অনুভব করি , তা আসলে সেই পরমপ্রেমেরই স্ফুলিঙ্গ , পক্ষান্তরে প্রকৃত ধর্মের স্ফুলিঙ্গ। ঐ বোধ যত বিস্তৃত হবে, ততই যথার্থ ধর্মের বিকাশ ঘটবে আমাদের জীবনে। ধর্মের লক্ষ্য হলো ঐ প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ। অন্যভাবে বলতে হলে বলা যায় যে, ধর্ম সানুষকে উদার হতে শিক্ষা দেয়, সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়, হিংসা-দ্বেষ-মুক্ত হতে শিক্ষা দেয় , পরস্পরকে প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে মিলিত হতে শিক্ষা দেয়। সঙ্কীর্ণতা , অসহিষ্ণুতা, ভেদ-বিবাদ কখনই ধর্মের বাণী হতে পারে না। তাদের সঙ্গে ধর্মের নয় , অধর্মেরই সম্পর্ক। তাদের প্রকাশ যেখানে হয়, সে-স্থান ধর্মের চূড়ান্ত বিপরীত আদর্শের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন উঠবে, আমি আমার নিকটজনকে ভালবাসতে পারি , তার বা তাদের সুখ -দুঃখের সহভাগী হতে পারি এই কারণে যে, সে বা তারা আমার সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত। কিন্তু নিকটজনের গণ্ডির বাইরে সেই বোধ বা দৃষ্টি কিভাবে আসা সম্ভব? এর উত্তরে ধর্ম বলে যে, তুমি তোমার নিকটজনের সঙ্গে রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত ঠিকই এবং সেইহেতু তুমি তোমার নিকটজনকে 'আত্মজন' ভাব, তার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ভাব, তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব কর। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও তো নিকট -সম্পর্ক তোমার স্থাপিত হয় , যেমন তোমার সঙ্গে তোমার বন্ধুর, যাকে তুমি হয়তো প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাস তোমার স্ত্রীর অথবা স্বামীর সঙ্গে তো তোমার রক্তের সম্পর্ক নেই, তথাপি স্ত্রীকে অথবা স্বামীকে কি তুমি তোমার রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়দের চেয়ে কম ভালবাস? পরন্তু জগতে মধুরতম সম্পর্ক তো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই। কিভাবে তা সম্ভব হলো? ভারতের ঋষিগণ এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন : "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। " (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।৫, ৪।৫।৬) পতির জন্যই যে পতি (পত্নীর) প্রিয় হন তা নয়, (পত্নী) নিজেকে ভালবাসে বলেই পতি তার প্রিয় হন। পত্নীর জন্যই যে পত্নী (পতির) আদরণীয়া হন তা নয় , (পতির) আত্মপ্রীতির জন্যই পত্নী পতির আদরণীয়া হন।

এই 'আত্মপ্রীতি' কেন? তা এই কারণে যে, আমাদের সকলের মধ্যে সেই পরম প্রেমস্বরূপ পরমাত্মা বিরাজ করছেন। আমি আমাকে ভালবাসি অর্থাৎ আমি আমার হৃদিস্থিত সেই পরমাত্মাকে ভালবাসি। তিনিই জীবাত্মারূপে আমার মধ্যে, আমার স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে, আমার সকল আত্মীয়ের মধ্যে, আমার বন্ধুর মধ্যে, ভারতের ও ব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করছেন। আমি আমার স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে বা অন্য আত্মীয় -বন্ধুদের মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে আমাকেই , আমার বৃহত্তম আমিকেই দেখছি বা অনুভব করছি বলেই এই আত্মপ্রীতি , এই পারস্পরিক আকর্ষণ, এই পারস্পরিক বন্ধন।

এথেকে আমরা বুঝলাম যে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতপক্ষে সকলের অন্তরাত্মা। সুতরাং ধর্ম বলছে, মূল অর্থে তুমিই তো রয়েছে পৃথিবীর সকলের মধ্যে। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ , সকল প্রাণীর মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে আমি তো কারো সঙ্গে বিবাদ করতে পারি না, কাউকেও ঘৃনা বা দ্বেষ-হিংসা করতে পারি না, কাউকেও আঘাত করতে পারি না।

এই তত্ত্ব থেকে আরেকটি তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধরূপেই আসে। তা হলো, মানুষ বা জীব মাত্রই স্বরূপত ঈশ্বর। প্রতিটি মানুষের মধ্যে, প্রতিটি জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর স্ফুলিঙ্গরূপে রয়েছেন। ঈশ্বরকে ধর্ম কখনো বলছে 'সত্য', কখনো বলছে 'শক্তি'। ধর্ম বলছে, জীবনের চরিতার্থতা হলো ঐ অন্তর্নিহিত ঈশ্বরকে বা সত্যকে বা শক্তিকে , যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত নই, প্রকাশ করা। ধর্মের মূল বক্তব্য হলো ঐ উন্মোচন বা আবিষ্কার বা বিকাশ। ঐ উন্মোচন বা আবিষ্কার বা বিকাশই হলো ধর্ম। এক বা একাধিক উন্নত মানুষ বৃহত্তর গোষ্ঠী -মানুষের প্রয়োজনে ধর্মমতগুলির প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু ধর্মকে কেউ প্রবর্তন করেননি। ধর্মের সঙ্গে 'যুগ-প্রয়োজন'-এরও কোন সম্পর্ক নেই। জগতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব-লগ্ণ থেকেই ধর্ম মানুষের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে, বিকশিত হতে শুরু করেছে। তার প্রয়োজনীয়তা কোন বিশেষ কালের জন্য বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বা বিশেষ ভূমি বা দেশের জন্য নয়। তার আবেদন সর্বকালীন, সর্বজনীন এবং সার্বভৌমিক। ধর্ম মানুষের সহজাত। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিতে, মানুষের স্বভাবেই নিহিত। যাকে আগে ঈশ্বর, সত্য বা শক্তি বলা হয়েছে, তাকেই আবার বলা হয় দিব্যত্ব বা দেবত্ব। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যত্ব বা দেবত্বকে স্বীকার করে এবং স্বীকার করে যে, পৃথিবীর মালিন্যের স্পর্শদোষে সহজাত দিব্যত্ব বা দেবত্ব থেকে মানুষের বিচ্যুতি ঘটে। দিব্যত্ব বা দেবত্বই ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপ। ধর্মমতগুলিতে উপাসনালয়, শাস্ত্র, প্রার্থনা, ব্রত, উপবাস, সন্তসঙ্গ, তীর্থ-পরিক্রমা প্রভৃতির উদ্ভব ক্রমে ক্রমে হয়েছে ঐ বিচ্যুতিকে রোধ করার মাধ্যম বা উপায় হিসাবে। ঐগুলি আর কিছুই নয় , বাইরে থেকে মানুষকে অন্তরের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসমাত্র এবং ঐগুলির আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তবে ঐগুলি নিতান্তই ধর্মের বহিরঙ্গ। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐগুলি ব্যক্তিবিশেষকে ধর্মজীবনে সত্যই এগিয়ে দেয় , তবে বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ঐগুলি মানুষের মঙ্গলের চেয়ে অনিষ্টই করে বেশি। ধর্মমতগুলিতে যে সঙ্কীর্ণতা , অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ-বিবাদ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও উপেক্ষা আমরা দেখে থাকি তার জন্য প্রদানত ধর্মমতগুলির স্বার্থান্বেষী নেতারাই দায়ী। দেখা যায় যে, তাদের জন্য ধর্মমতগুলি ক্রমেই অধিকতর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় এবং এক ধর্মমত বা ধর্মসম্প্রদায় অপর ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে দেয়। দুঃখের বিষয় , সাধারণের কাছে ধর্মমতই হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম এবং ধর্মমতে মত হয়ে যায় প্রধান, ধর্ম চলে যায় দূরে-অন্তরালে। ভেদ-বিবাদের চির অবসান ধর্মের লক্ষ্য , কিন্তু ধর্মমতগুলিতে দেখা যায় যে , ভেদ-বিবাদের চির অবস্থান তাদের ব্যাপকভাবে চিহ্নিত করে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে উপায় কি ? উপায় ধর্মের মর্মকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা , ধর্মমতগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সমুচ্চয়ের সূত্রগুলিকে তুলে ধরা। বলতে দ্বিধা নেই যে, বেদান্তের মধ্যে এর সমাধান রয়েছে এবং সেই সমাধানের প্রনালী ও পদ্ধতি সাম্প্রতিককালে রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ ভারত ও পৃথিবীকে দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের জীবন ও বাণীতে।